Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-2 Issue-2 January 2024

শিবশক্তিতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ

শম্ভুনাথ কর্মকার

Link : https://bit.ly/4285Q7e

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথের শিব ও শক্তি তত্ত্বের চর্চা মূলত বাংলা মঙ্গালকাব্য প্রসঙ্গে হলেও অষ্টাদশ শতকের শক্তিসাধনা এবং শাক্ত পদাবলির অন্তরঙ্গ রসরহস্য বিষয়ে তাঁর স্বল্প আলোচনার পরিসরটিও অপ্রধান নয়। পৌরাণিক ও লৌকিক শিবচরিত্রের ইতিবৃত্ত রচনায় তিনি ধারাবাহিকভাবে তথ্য ও সত্যের যথাক্রম রক্ষা করেছেন। একদিকে তিনি যেমন শক্তির অসহমান প্রকৃতির সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনই ভারতের সামাজিক ইতিহাসে নিমীলিতপ্রায় শৈব ধর্মের মঙ্গালসূত্রটি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। মানবজীবনের রূপধেয়-চেতনায় শিবশক্তির কল্যাণময় স্বরূপটিই তাঁর আলোচনার উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

সূচক শব্দ : ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্য, অনার্য, ভাব, রস, বাৎসল্য

মানবজীবনে শক্তির লীলা প্রবহমান। সাধনার ক্ষেত্রে এই নিত্য প্রবহমান শক্তিই একটু বিশেষ হয়ে ওঠে। সাহিত্যে তার পরিচয় যেমন বিমূর্ত তেমনই বিশ্বজনীন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাগীতির মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতত্ত্বের অন্তরঙ্গ পরিচয় সমুদ্ভাসিত। বৌদ্ধ তন্ত্র ও দর্শনের প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়। চর্যায় যার সূচনা, মঙ্গালকাব্যে তার বিকাশ এবং শাক্ত পদাবলিতে তার অভিনন্ধ পরিণতি। এই কালপর্বে যেমন দেবীর নামের পরিবর্তন দেখা গিয়েছে তেমনই দেবীর স্বরূপ বিবর্তিত হয়ে করুণাময়ী জগজ্জননীতে রূপান্তরের চিত্র প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গাভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই রূপান্তরের ইতিহাসটি তুলে ধরেছেন —

"প্রাচীন বঙ্গাসাহিত্যে এই পরিবর্তন পরম্পরার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগ ও শিবপূজার কালে বঙ্গাসাহিত্যের কী অবস্থা ছিল তাহা দীনেশবাবু খুঁজিয়া পান নাই। 'ধান ভানতে শিবের গীত' প্রবাদে বুঝা যায়, শিবের গীত এক সময়ে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে-সমস্তই সাহিত্য হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের যে-সকল চিহ্ন ধর্মমঙ্গাল প্রভৃতি কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় সে-সকলও বৌদ্ধযুগের বহুপরবর্তী। আমাদের চক্ষে বঙ্গাসাহিত্যমঞ্চের প্রথম যবনিকাটি যখন উঠিয়া গেল তখন দেখি সমাজে একটি কলহ বাধিয়াছে, সে দেবতার কলহ। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানির পঞ্চম অধ্যায়ে দীনেশবাবু প্রাচীন শিবের প্রতি চণ্ডী বিষহরি ও শীতলার আক্রমণব্যাপার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। এই-সকল স্থানীয় দেবদেবীরা জনসাধারণের কাছে বল পাইয়া কিরূপ দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা বঙ্গাসাহিত্যে তাঁহাদের ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে, দেবী চণ্ডী নিজের পূজাস্থাপনের জন্য অস্থির। যেমন করিয়া হউক, ছলে বলে কৌশলে মর্তে পূজা প্রচার করিতে হইবেই। ইহাতে বুঝা যায়, পূজা লইয়া একটা বাদবিবাদ আছে। তাহার পর দেখি, যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া দেবী পূজা প্রচার করিতে উদ্যত তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক নহে। যে নীচের তাহাকেই উপরে উঠাইবেন, ইহাতেই দেবীর শক্তির পরিচয়। নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এমন সান্ত্বনা এমন বলের কথা আর কী আছে! যে দরিদ্র দুইবেলা আহার জোটাইতে পারে না সেই শক্তির লীলায় সোনার ঘড়া পাইল ; যে ব্যাধ নীচজাতীয়, ভদ্রজনের অবজ্ঞাভাজন, সেই মহত্ত্বলাভ করিয়া কলিঙ্গারাজের কন্যাকে বিবাহ করিল। — ইহাই শক্তির লীলা।"[১]

মঙ্গালকাব্যে শিবের সঙ্গে শক্তির লড়াই ঘরে-বাইরে বিস্তৃত। শিবের গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তার প্রামাণিক সম্বল একটি প্রবচন — 'ধান ভানতে শিবের গীত'। আশুতোষ ভট্টাচার্য এই প্রবচনের ইঙ্গিতবাহী ইতিহাস সম্পর্কে লিখেছেন, "ইহা হইতেই এ'দেশে একটি লৌকিক শিব-গীতিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্রভাবে এই গীতিকা আজ পর্যন্ত কোথা হইতেও আবিষ্কৃত হইয়া মুদ্রিত হয় নাই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে এই শিব-গীতিকার কোন কোন অংশের সঙ্গে আজিও পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও যে বাংলার সমাজে ইহার একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ রূপ বহুল প্রচলিত ছিল, সে যুগের বাংলা সাহিত্যে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতকার কবি

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাসের তথ্যরাশিতে পরিপূর্ণ।"[২] সমাজে শিবপুজোর প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই। মধ্যযুগের সমাজ ও সাহিত্যে উল্টোরথের চাকার ঘর্ঘর শোনা গেল শক্তির মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায়। যাকে রবীন্দ্রনাথ 'শক্তির খেলা' শব্দবন্ধে চিহ্নিত করেছেন তা দয়া-মায়া, স্নেহ-করুণা, ন্যায়-অন্যায়ের বোধকে উপেক্ষা করে অপ্রতিহত গতিতে আপন মহিমার গন্তব্যে উপনীত — "কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের গল্পে দেখিতে পাই, শক্তির ইচ্ছায় নীচ উচ্চে উঠিয়াছে! কেন উঠিয়াছে তাহার কোনো কারণ নাই; ব্যাধ যে ভক্ত ছিল, এমনও পরিচয় পাই না। বরঞ্চ সে দেবীর বাহন সিংহকে মারিয়া দেবীর ক্রোধভাজন হইতেও পারিত। কিন্তু দেবী নিতান্তই যথেচ্ছাক্রমে তাহাকে দয়া করিলেন। ইহাই শক্তির খেলা।"[৩] এখানে লীলা ও খেলার মধ্যে ভেদ খুব একটা স্পষ্ট নয়। তার কারণও হয়তো শক্তির উপদ্রব বা তার জোরের জায়গাটিই প্রধান বলে। বিষয়টির অপ্রতিকূল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ক্ষমাই শক্তিমানের ভূষণ। কিন্তু ক্ষমাপ্রকাশের মধ্যেই শক্তির সৌন্দর্য-অনুভব তো সকলের কর্ম নহে। বরঞ্চ সাধারণ মূঢ় লোকেরা শক্তির উপদ্রব দেখিলেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ করে। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। কিন্তু সাজসজ্জার চেয়ে এই লজ্জার সৌন্দর্য কে দেখিতে পায়? যে ব্যক্তি সৌন্দর্যকে সংকীর্ণ করিয়া দেখে না। সংকীর্ণ প্রকাশের তরঙ্গাভঙ্গা যখন বিস্তীর্ণ প্রকাশের মধ্যে শান্ত হইয়া গেছে তখন সেই বড়ো সৌন্দর্যকে দেখিতে হইলে উচ্চভূমি হইতে প্রশস্ত ভাবে দেখা চাই। তেমন করিয়া দেখার জন্য মানুষের শিক্ষা চাই, গাম্ভীর্য চাই, অন্তরের শান্তি চাই।"[৪] শক্তিদেবতার উত্থানের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ শিবের অভ্যুত্থানের ইতিহাস বিবৃত করেছেন অত্যন্ত সুকৌশলে। সুকৌশলে কেন, তার কারণ আমরা পরে আলোচনা করছি। এখন রবীন্দ্র-রচিত ইতিহাসটুকু তুলে ধরছি :

"শিবের যখন প্রথম অভ্যুত্থান হইয়াছিল তখন বৈদিক দেবতারা যে তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে স্থান দিতে চান নাই তাহা দক্ষযজ্ঞের বিবরণেই বুঝা যায়। বস্তুতই তখনকার অন্যান্য আর্যদেবতার সহিত এই বিলোচনের অত্যন্ত প্রভেদ। দক্ষের মুখে যে-সকল নিন্দা বসানো হইয়াছিল তখনকার আর্যমণ্ডলীর মুখে সে নিন্দা স্বাভাবিক। সমস্ত দেবমণ্ডলীর মধ্যে ভূতপ্রেতপিশাচের দ্বারা এই অদ্ভুত দেবতা-কর্তৃক দক্ষযজ্ঞধ্বংস কেবল কাল্পনিক কথা নহে। ইহা একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের তুল্য। আর্যমণ্ডলীর যে বৈদিক যজ্ঞে প্রাচীন আর্যদেবতারা আহূত হইতেন সেই যজ্ঞে এই শ্মশানেশ্বরকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই এবং তাঁহাকে অনার্য অনাচারী বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছিল; সেই কারণে তাঁহার সেবকদের সহিত আর্যদেবপূজকদের প্রচণ্ড বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে অনার্য ভূত প্রেত পিশাচের দ্বারা বৈদিক যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় এবং সেই শোণিতাক্ত অপবিত্র যজ্ঞবেদীর উপরে নবাগত দেবতার প্রাধান্য বলপূর্বক স্থাপিত হয়।"[৫]

'কথাসরিৎসাগর'এর গল্প অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শিবশক্তির উদ্ভবের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। সেই ইতিবৃত্ত অনুসারে "এই মুণ্ডমালী প্রেতেশ্বর ভীষণ দেবতা আর্যদের হাতে পড়িয়া ক্রমে কিরূপ পরমশান্ত যোগরত মঙ্গালমূর্তি ধারণ করিয়া বৈরাগ্যবানের ধ্যানের সামগ্রী হইয়াছিলেন তাহা কাহারও অগোচর নাই। কিন্তু তাহাও ক্রমশ হইয়াছিল। অধুনাতন কালে দেবী চণ্ডীর মধ্যে যে ভীষণচঞ্চল ভাবের আরোপ করা হইয়াছে এক সময়ে তাহা প্রধানত শিবের ছিল। শিবের এই ভীষণত্ব কালক্রমে চণ্ডীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া শিব একান্ত শান্তনিশ্চল যোগীর ভাব প্রাপ্ত হইলেন।"[৬]

সমাজের নিম্নস্তরে মনসা, চণ্ডীর পুজো আড়ম্বরের সঙ্গে শুরু হলেও শিবের পুজোয় সেই জাঁকজমক অনুপস্থিত ছিল। শিবায়ন কাব্য-প্রচারের স্তিমিত গতি দেখলেই তা বোঝা যায়। শিব যদি অনার্যদেব হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর অর্ধাঙ্গিনী, শক্তিরূপিণী পার্বতীও কি অনার্যদেবতা নন? এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত দেশ-কাল-সমাজের প্রভাবের কথা স্বীকার করে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, বাঙলাদেশ মুখ্যভাবে আর্য-অধ্যুষিত দেশ নহে; এ দেশের সমাজদেহে আর্যরক্তের মিশ্রণ অধিক নহে — এবং এই কারণেই হয়ত এ দেশের ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে বৈদিক আর্য প্রভাব সর্বাতিশয়ী রূপে দেখা দেয় নাই। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় হইতে উচ্চকোটির জনগণের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে কিছু কিছু আর্যপ্রভাব দেখা দিয়াছে; তাহাকেও আমরা বিশুদ্ধ বৈদিক আর্যপ্রভাব বলিতে পারি না — একটা সমন্বয়জাত মিশ্র হিন্দু প্রভাব। এই হিন্দু প্রভাবের পাশাপাশি দেখা দিয়াছিল কিছু জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভাব। পাল-রাজত্বে এই বৌদ্ধ প্রভাবই প্রাধান্য লাভ করিল — সেন-রাজত্বে একটা হিন্দু-পুনরুত্থানের আভাস। এ পর্যন্ত শক্তিধর্ম ও মাতৃপূজার চিহ্ন গৌণরূপে এখানে সেখানে প্রকট — মুসলমান বিজয়ের পর হইতে উচ্চকোটির ধর্মমতের উপরে যখন প্রবল আঘাত দেখা দিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজদেহের অন্যান্য স্তর হইতে এই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠিল এবং তাহার ফলেই হয়ত বাঙলাদেশে মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনার এত প্রসার।"[৭] নিরপেক্ষ বিচারে তিনি এই মত সর্বাংশে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই লিখেছেন, "মাতৃপূজা এবং শক্তিসাধনা সম্পূর্ণরূপে অবৈদিক বা অনার্য একথা বলিবার যৌক্তিকতা দেখিতে পাইতেছি না।... যাহা কিছু অবৈদিক তাহাই অনার্য এমন কথা মনে করিবারও কোনও কারণ নাই। আর্যগণ সকলেই বৈদিক আর্য ছিলেন একথা নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ করিবার মত তথ্য আছে কি? ইহা ব্যতীত পূর্বালোচিত মতটি সম্বন্ধে আমাদের প্রধান আপত্তি হইল এই যে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হইতেই যদি ধর্মের ক্ষেত্রে

মাতৃপূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া উচিত ছিল; কারণ এই-জাতীয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পৃথিবীর বহু স্থানে বহু প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে।"[৮] রবীন্দ্রনাথ এরকম কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসেননি। তিনি শিবচরিত্রে ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের সমন্বয় লক্ষ করেছেন — যাকে আমরা 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' সন্ধানের চেষ্টা বলতে পারি। আর তা করতে গিয়ে পরিবর্তিত যুগমানস ও সমাজ-বিবর্তনের ধারায় লোকবিশ্বাস, আচারবিধি, সংস্কার ও সংস্কৃতির পরম্পরা-নির্ঝরে স্নাত নিঃশ্রেয়স-দেবতার নির্মল স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে — "কখনো সাংখ্যের ভাবে, কখনো বেদান্তের ভাবে, কখনো মিশ্রিত ভাবে, এই শিবশক্তি কখনো বা জড়িত হইয়া কখনো বা স্বতন্ত্র হইয়া ভারতবর্ষে আবর্তিত হইতেছিলেন। এই রূপান্তরের কালনির্ণয় দুরূহ। ইহার বীজ কখনো ছড়ানো হইয়াছিল এবং কোন্ বীজ কখন অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সন্ধান করিতে হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই-সকল পরিবর্তনের মধ্যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বিপুল ভারতসমাজ-গঠনে নানাজাতীয় স্তর যে মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা নিয়তই আমাদের ধর্মপ্রণালীর নানা বিসদৃশ ব্যাপারের বিরোধ ও সমন্বয়চেষ্টায় স্পষ্টই বুঝা যায়। ইহাও বুঝা যায়, অনার্যগণ মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং আর্যগণ তাহাদের অনেক আচারব্যবহার-পূজাপদ্ধতির দ্বারা অভিভূত হইয়াও আপন প্রতিভাবলে সে-সমস্তকে দার্শনিক ইন্দ্রজালদ্বারা আর্য আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া লইতেছিলেন। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেক দেবদেবীর কাহিনীতে এত বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা, একই পদার্থের মধ্যে এত বিরুদ্ধ ভাবের ও মতের সমাবেশ।"[৯] রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়োক্ত ভাষ্যকে শিরোধার্য করে নিয়ে আমরা তাঁর সমালোচনা-কুশলতার পরিচয় দেব। 'নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার' প্রেক্ষাপটে মধ্যযুগের সাধারণ মানুষ 'মেয়ে দেবতা'র জয় সুনিশ্চিত করেছিল। এবং 'উপেক্ষিত সাধারণ যেন তাহাদের প্রচণ্ডশক্তি মাতৃদেবতার আশ্রয় লইয়া ভদ্রসমাজে শান্তসমাহিতনিশ্চেষ্ট বৈদান্তিক যোগীশ্বরকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।"[১০] একে রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফলের বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁকে কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। তিনিও তো সমন্বয় চেয়েছেন সারাজীবন। এ তত্ত্ব তো তাঁর মনস্তত্ত্ব। তাই ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক অনুক্রমটিকে লক্ষ করেই 'কবির দীক্ষা'য় লিখেছেন, "কালিদাস ছিলেন শৈব।/ সেই পথের পথিক কবিরা।"[১১] বিদ্রোহের প্রসঙ্গটিকে শঙ্করাচার্য এবং তাঁর অনুসারীদের মতামত দিয়েও পুনর্বিচার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা প্রথমে বিদ্রোহের বিবরণটি উদ্ধৃত করছি — "শঙ্করাচার্যের ছাত্রগণ যখন বিদ্যাকেই প্রধান করিয়া তুলিয়া জগৎকে মিথ্যা ও কর্মকে বন্ধন বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছিলেন তখন সাধারণে মায়াকেই, শান্তস্বরূপের শক্তিকেই, মহামায়া বলিয়া শক্তীশ্বরের ঊর্ধ্বে দাঁড় করাইবার জন্য খেপিয়া উঠিয়াছিল। মায়াকে মায়াধিপতির চেয়ে বড়ো বলিয়া ঘোষণা করা, এই এক বিদ্রোহ।"[১২] এবার উদ্ধৃত করছি এই বিদ্রোহের রবীন্দ্রকৃত পুনর্বিচার এবং মূল্যায়ন — "ভারতবর্ষে এই বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত কবে হইয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু এই বিদ্রোহ দেখিতে দেখিতে সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। কারণ, ব্রহ্মের সহিত জগৎকে ও আত্মাকে প্রেমের সম্বন্ধে যোগ করিয়া না দেখিলে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হয় না। তাঁহার সহিত জগতের সম্বন্ধ স্বীকার না করিলেই জগৎ মিথ্যা, সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই জগৎ সত্য। যেখানে ব্রহ্মের শক্তি বিরাজমান সেইখানেই ভক্তের অধিকার, যেখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সেখানে ভক্তির মাৎসর্য উপস্থিত হয়। ব্রহ্মের শক্তিকে ব্রহ্মের চেয়ে বড়ো বলা শক্তির মাৎসর্য, কিন্তু তাহা ভক্তি। ভক্তির পরিচয়কে একেবারেই অসত্য বলিয়া গণ্য করাতে ও তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ হইবার চেষ্টা করাতেই ক্ষুব্ধ ভক্তি যেন আপনার তীর লঙ্ঘন করিয়া উদ্‌বেল হইয়াছিল।"[১৩] ভক্তির সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ধর্ম ও রসতত্ত্বের আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। এবং শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের তুলনামূলক চর্চায় শিব-শক্তির সমন্বয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে "... কী আধ্যাত্মিক, কী আধিভৌতিক, ঝড় কখনোই চিরদিন থাকিতে পারে না। ভক্তহৃদয় এই চণ্ডীশক্তিকে মাধুর্যে পরিণত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম আশ্রয় করিল। প্রেম সকল শক্তির পরিণাম; তাহা চূড়ান্ত শক্তি বলিয়াই তাহার শক্তিরূপ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ভক্তির পথ কখনোই প্রচণ্ডতার মধ্যে গিয়া থামিতে পারে না : প্রেমের আনন্দেই তাহার অবসান হইতে হইবে। বস্তুত মাঝখানে শিবের ও শক্তির যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের মধ্যে সেই শিব-শক্তির কতকটা সম্মিলনচেষ্টা দেখা যাইতেছে। মায়াকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিলে তাহা ভয়ংকরী, ব্রহ্মকে মায়া হইতে স্বতন্ত্র করিলে ব্রহ্ম অনধিগম্য — ব্রহ্মের সহিত মায়াকে সম্মিলিত করিয়া দেখিলেই প্রেমের পরিতৃপ্তি।"[১৪]

প্রেমধর্মের জয় ঘোষণা করেই রবীন্দ্রনাথ শান্ত হননি; শাক্ত পদাবলিতে উদ্ভাসিত উমা, শ্যামার স্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন। দয়ামায়াহীন, ধর্মাধর্মবিবর্জিত শক্তির আধিপত্য সম্বন্ধে মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্যের কবিরা উদাসীন ছিলেন না, তাই শক্তির দেবতাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের মতে "এই শক্তির প্রসন্ন মুখ মাতা, এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী। ইহারই 'প্রসাদোঽপি ভয়ংকরঃ'; সেইজন্য সর্বদাই করজোড়ে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ ইনি যাহাকে প্রশ্রয় দেন ততক্ষণ তাহার সাত-খুন মাপ; যতক্ষণ সে প্রিয়পাত্র ততক্ষণ তাহার সংগত-অসংগত সকল আবদারই অনায়াসে পূর্ণ হয়।"[১৫] ভয়ে ভক্তির কথা — সমাজে প্রচলিত প্রবাদবাক্যতুল্য। দুর্বল শ্রেণির জীব চিরকাল ক্ষমতাবানের কাছে সহজে মাথা নত করে। এবং "এইরূপ শক্তি ভয়ংকরী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার কাছে প্রত্যাশার কোনো সীমা নাই। আমি অন্যায় করিলেও জয়ী

হইতে পারি, আমি অক্ষম হইলেও আমার দুরাশার চরমতম স্বপ্ন সফল হইতে পারে। যেখানে নিয়মের বন্ধন, ধর্মের বিধান আছে, সেখানে দেবতার কাছেও প্রত্যাশাকে খর্ব করিয়া রাখিতে হয়।"[১৬]

মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্য সম্বন্ধে একথা বললেও মঙ্গালকাব্যের শক্তিবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও মূল্যায়ন একই।

শৈব ধর্মের ভাঙনের ইতিহাস-পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের শৌভিক উত্থানকেই কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পর থেকে শৈব ধর্ম অদ্বৈতবাদকে আশ্রয় করে সমাজব্যবস্থায় অল্পস্বল্প প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু যখনই বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম ঈশ্বরকে দ্বিধাবিভক্ত করে স্থাপিত হলো গণমানসে তখনই শৈব ধর্ম সন্ন্যস্ত হলো, তার প্রভাবও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারল না। এর মধ্যে শাক্তের প্রভাব প্রবল এবং দুর্জ্ঞেয়। রবীন্দ্রনাথের মতে, "যে শক্তি ভীষণ, যাহা খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমাদিগকে দূরে রাখিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয়; সে আমার সমস্ত দাবি করে, তাহার উপর আমার কোনো দাবি নাই। শক্তিপূজায় নীচকে উচ্চে তুলিতে পারে, কিন্তু উচ্চ-নীচের ব্যবধান সমানই রাখিয়া দেয়, সক্ষম-অক্ষমের প্রভেদকে সুদৃঢ় করে। বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি; সে শক্তি বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করে তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ।... শাক্তধর্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ, ও বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ ; শক্তির লীলায় কে দয়া পায় কে না পায় তাহার ঠিকানা নাই ; কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে সেখানে সকলেরই নিত্য দাবি। শাক্তধর্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে; বৈষ্ণবধর্মে এই ভেদকে নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।"[১৭]

অষ্টাদশ শতকের বিধ্বস্ত বাঙালি-সমাজে শাক্ত পদকর্তাদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে নতুন যুগের সূচনা সম্ভব হয়েছে। প্রাণের দায়ে মানুষ মা বলে ডেকেছে। দুরধিগম্য পথ অতিক্রম করে নবরূপে মাতৃআরাধনার এই সমারোহহীনতায় আপামর বাঙালি নিশ্চিন্তে অবগাহন করেছে। মায়ের প্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে তারা আশার আলো দেখেছে। অনাথসহায় উঠেছেন শক্তির দেবতা, উপাসক হয়ে উঠেছেন রামপ্রসাদ, কমলাকান্তর মতো কবি। অষ্টাদশ শতকের শক্তিসাধনার সঙ্গো তার পূর্ববর্তী শক্তিপুজোর তফাত এখানেই। এ প্রসঙ্গো রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "শাক্ত যে পূজা অবলম্বন করিয়াছিল তাহা তখনকার কালের অনুগামী। অর্থাৎ সমাজে তখন যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যে শক্তির খেলা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছিল, যে-সকল আকস্মিক উত্থানপতন লোককে প্রবলবেগে চকিত করিয়া দিতেছিল, মনে মনে তাহাকেই দেবত্ব দিয়া শাক্তধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম এক ভাবের উচ্ছ্বাসে সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সাময়িক অবস্থার বন্ধন হইতে এক বৃহৎ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিষ্কৃতিদান করিয়াছিল। শক্তি যখন সকলকে পেষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দলন করিতেছিল, তখনই সে প্রেমের কথা বলিয়াছিল। তখনই সে ভগবানকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল, এমন-কি, প্রেমের স্পর্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্যকে উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে করিয়া যে ব্যক্তি তৃণাদপি নীচ সেও গৌরব লাভ করিল; যে ভিক্ষার ঝুলি লইয়াছে সেও সম্মান পাইল; যে ম্লেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইল। তখন সাধারণের হৃদয় রাজার পীড়ন সমাজের শাসনের উপরে উঠিয়া গেল। বাহ্য অবস্থা সমানই রহিল, কিন্তু মন সেই অবস্থার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিখিলজগৎসভার মধ্যে স্থানলাভ করিল। প্রেমের অধিকারে, সৌন্দর্যের অধিকারে, ভগবানের অধিকারে, কাহারও কোনো বাধা রহিল না।"[১৮] কিন্তু পৌরুষের অভাবে নিষ্ঠার অসত্তায় হৃদয়ধর্ম বঞ্চিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আগে এবং পরে এই বিষয়ে কোনো সমালোচক বিন্দুমাত্র আলোকপাত করেননি। তিনি মনে করেছেন —

"আমরা ভাব উপভোগ করিয়া অশ্রুজলে নিজেকে প্লাবিত করিয়াছি; কিন্তু পৌরুষ-লাভ করি নাই, দৃঢ়নিষ্ঠা পাই নাই। আমরা শক্তিপূজায় নিজেকে শিশু কল্পনা করিয়া মা মা করিয়া আবদার করিয়াছি এবং বৈষ্ণবসাধনায় নিজেকে নায়িকা কল্পনা করিয়া মান-অভিমানে বিরহ-মিলনে ব্যাকুল হইয়াছি। শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে বীর্যের পথে লইয়া যায় নাই, প্রেমের পূজা আমাদের মনকে কর্মের পথে প্রেরণ করে নাই। আমরা ভাববিলাসী বলিয়াই আমাদের দেশে ভাবের বিকার ঘটিতে থাকে, এবং এইজন্যই চরিতকাব্য আমাদের দেশে পূর্ণ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। এক দিকে দুর্গায় ও আর-এক দিকে রাধায় আমাদের সাহিত্যে নারীভাবই অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।... পৌরুষের অভাব ও ভাবরসের প্রাচুর্য বঙ্গাসাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বঙ্গাসাহিত্যে দুর্গা ও রাধাকে অবলম্বন করিয়া দুই ধারা দুই পথে গিয়াছে; প্রথমটি গেছে বাংলার গৃহের মধ্যে, দ্বিতীয়টি গেছে বাংলার গৃহের বাহিরে। কিন্তু এই দুইটি ধারারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রমণী এবং এই দুইটিরই স্রোত ভাবের স্রোত।"[১৯]

ভাবের জোয়ারে বাংলাদেশ প্লাবিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু অভিনিবিষ্ট চিত্তের সংযমের চিহ্নমাত্র তাতে ছিল না বলেই মানব-জমিনের তফাত থেকে গিয়েছে অনেকটাই। সাহিত্যেও তার বৈনাশিক প্রভাব পড়েছে।

শাক্ত পদাবলির বাৎসল্য রসের ব্যাখ্যা আলাদাভাবে না করলেও সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহের ধারাবর্ষণকে রবীন্দ্রনাথ দেবতার

আশিস বলেই মনে করেছেন। নির্লোভ, বাসনামুক্ত, মার্জিত চিত্তে স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তির চন্দনসৌরভ সাধনক্ষেত্রটিকে উন্মুক্ত ও পবিত্র করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "উপাসনা করিবার একটা ফল, উপাসনা করিবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি করা — আর-একটি চরম ফল, যাঁহার উপাসনা করি তাঁহার আদর্শের দিকে আপনাকে নিয়ত প্রসারিত করা। সেই নিয়ত প্রসারণে যেমন আনন্দ তেমনি উন্নতি। অতএব যদি ইহা সত্য হয় যে, মানুষ ঈশ্বরকে মানসিকতা হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্মুক্ত করিয়া দেখিতে পারে না, তবে দ্বিগুণ সতর্কতার সহিত তাঁহাকে এমন-সকল সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধারণ করা উচিত যদ্দ্বারা তাঁহার আদর্শ পার্থিব আদর্শের মতো খাটো হইয়া না যায়। তাঁহাকে অসীমস্নেহময় বলিলেও, যদি বা মনে মনে মাতৃস্নেহের সহিত তাঁর স্নেহের তুলনা না করিয়া থাকিতে পারি না, তথাপি আমাদের স্নেহের আদর্শ যতই উৎকর্ষ লাভ করুক স্নেহময় বিশেষণকে অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু যদি একটা বিশেষ কাহিনীদ্বারা তাঁহার স্নেহের আদর্শকে বন্ধ করি, যদি বলি তিনি বনের ব্যাধকে গুজরাটের রাজা করিয়া দিয়াছিলেন, তবে লোকবিশেষের কাছে তাহা আদরণীয় হইতে পারে, কিন্তু অপর লোকের কাছে তাহা অন্যায় পক্ষপাত বলিয়া হেয় হইতে পারে। যে লোক গুজরাটের রাজত্ব চায় দেবতার স্তবপক্ষপাতধর্ম তাহার কাছে রমণীয়, কিন্তু যে তাঁহাকে চায় সে জানে সাধনার দ্বারা তাঁহার অক্ষয় স্নেহ অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি, রাজত্বে নহে, মকদ্দমা-জয়ে নহে, সাংসারিক উন্নতিতে নহে। অতএব ঈশ্বরকে যদি স্নেহময় বলিয়া জানি, তবে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তাঁহার স্নেহের লাঘব দেখি না। কিন্তু তাঁহাকে যদি কবিকঙ্কণের চণ্ডী বলিয়া জানি তবে আমার মনে স্নেহের যে আদর্শ আছে তাহা অপেক্ষাও তাহাকে অনেক কম করিয়া জানি। যদি সেইরূপ কম করিয়া জানি তথাপি বেশি করিয়া ভক্তি করি, তবে সে ভক্তি বন্ধ্যা হয়।"[২০] এই মন্তব্য সাকার ও নিরাকার উপাসনা সম্পর্কে হলেও শাক্ত পদাবলির বাৎসল্য রসতত্ত্ব সম্বন্ধেও যথেষ্ট উপযুক্ত।

ধর্মভীরু মানুষ শক্তির বীভৎসতাকে মেনে নিয়েই জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়। ভয় ও অন্ধ ভক্তি মানুষকে সভ্যতার সবচেয়ে কৃত্রিম ও নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করে। শক্তিপুজোর ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে যথেষ্ট।

শক্তির প্রয়োজন অন্তরঙ্গ সাধনার ক্ষেত্রে; শিবশক্তির উপাসনাতত্ত্বের সারকথাও তো তাই। ভোগ নয়, ত্যাগের মধ্য দিয়ে জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌঁছনোই শক্তিসাধনার চরম সত্য — "শক্তিতত্ত্ব, যার বাহ্যপ্রকাশ আয়তনে, সেটাই চরমতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্ব নয়। বিশ্বের তাল মেলাবার বেলায় আপনাকে তার থামিয়ে দিতে হয়। সেই সংযমের সিংহদ্বারই হচ্ছে কল্যাণের সিংহদ্বার। এই কল্যাণের মূল্য আয়তন নিয়ে নয়, বহুলতা নিয়ে নয়। যে এঁকে অন্তরে জেনেছে, সে ছিন্ন কন্থায় লজ্জা পায় না, সে রাজমুকুট ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে পারে।"[২১] বিবিধ উপচার, পশুবলি, আয়োজনে দেবতাকে তুষ্ট করবার পন্থা যথাযথ কিনা তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সাধক যখন পরম কারণ সম্বন্ধে সচেতন হন তখনই আর ভেদ থাকে না, সাম্যভাবে আলোকিত হয় মনোজগৎ — মহাবিশ্বের অণু-পরমাণু। অমরেন্দ্রনাথ রায়ের কথায় —

"এই পরম কারণটা যে কি ও কেমন, তাহা বুঝিতে না পারিলে শ্যাম-শ্যামার রূপ-বর্ণনা, ভেদ ও সাম্যভাব ঠিকমত উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে বুঝাইতে গেলে বলিতে হয় যে, জগন্মাতৃত্ব এবং জগৎপিতৃত্ব এই উভয় শক্তি-সমন্বিত স্বপ্রকাশ চৈতন্য-সমুদ্রের নামই পরম কারণ। যখন পিতৃত্ব-শক্তির মধ্য দিয়া সেই স্বপ্রকাশ পদার্থ লক্ষিত হন, তখন তাঁহাকে জগৎ-পিতা পরমেশ্বর এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। আর কেবল মাতৃত্বের আশ্রয় লইয়া যখন সেই চিন্ময় সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য করা হয়, তখন তাঁহাকে জগন্মাতা বা পরমেশ্বরী বলা হয়, — কালী, দুর্গা, তারা প্রভৃতিও তাঁহারই নাম। ইহা আমাদের মন গড়া কথা নহে। আর্যশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই এই তত্ত্ব-নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন, তন্ত্রশাস্ত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধী, তাঁহারা অজ্ঞতাবশতঃই উহা বলিয়া থাকেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, — 'সর্ব্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা' — এই তন্ত্র-নির্দ্দেশই প্রত্যেক বৈষ্ণব আচার্য্য কর্তৃক দীক্ষাদানকালে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্রে ভেদ-জ্ঞানের খুবই নিন্দা আছে। রূপভেদ, নামভেদ, মন্ত্রভেদ প্রভৃতির সৃষ্টি কেবল উপাসকগণেরই সুবিধার জন্য। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" — ইহা তন্ত্রেরই কথা।[২২]

রবীন্দ্রনাথের কথাও তো এর থেকে আলাদা নয়। শাক্ত পদাবলি যে শান্তি, প্রীতি ও মৈত্রীর বাণীবহ এবং জীবনঘনিষ্ঠ তা তো রবীন্দ্রনাথ খুব ভালো করেই জানতেন। প্রথাবদ্ধ শিক্ষালাভে নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে তিনি 'ছেলেবেলা'য় লিখেছেন, "সেজদাদার হাতে আমার অন্য বিদ্যের যে গোড়াপত্তন হয়েছিল সেও খুব ফলাও রকমের। বিশেষ কিছু ফল হয় নি, সে স্বভাবদোষে। আমার মতো মানুষকে মনে রেখেই রামপ্রসাদ সেন বলেছিলেন, 'মন, তুমি কৃষিকাজ বোঝো না।' কোনোদিন আবাদের কাজ করা হয় নি।"[২৩] এমন ভূমিলগ্ন অকপট স্বীকারোক্তি অলক্ষণীয়।

যে-শক্তির দেবতাকে সমর্পণের সাধনা ভেবে অযুত নৈবেদ্য অর্পণ করে সাধারণ মানুষ আনন্দবোধ করে তা তো আসলে বহিরঙ্গ আচার মাত্র। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই লিখেছেন, "শক্তিতত্ত্ব থেকে সুষমাতত্ত্বে এসে পৌঁছিয়েই বুঝতে পারি, ভুল

জায়গায় এতদিন এত নৈবেদ্য জুগিয়েছি। বলির পশুর রক্তে যে-শক্তি ফুলে উঠল সে কেবল ফেটে মরবার জন্যেই। তার পিছনে যতই সৈন্য যতই কামান লাগাই-না কেন, রণতরীর পরিধি যতই বৃদ্ধির দিকে নিয়ে চলি, লুঠের ভাগকে যতই বিপুল করে তুলতে থাকি, অঙ্কের জোরে মিথ্যাকে সত্য করা যাবে না, শেষকালে ঐ অতিবড়ো অঙ্কেরই চাপে নিজের বস্তার নীচে নিজে গুঁড়িয়ে মরতে হবে।"[২৪]

ভারতবর্ষে শিব ও শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-দুটি প্রচলিত ধারা লক্ষ করেছেন তা হলো শাস্ত্রিক ও লৌকিক। তাঁর মতে "শাস্ত্রিক শিব যতী, বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল। বাংলা মঙ্গালকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই। এমন-কি, রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গালে শিবের যে চরিত্র বর্ণিত সে আর্যসমাজসম্মত নয়।"[২৫] অপরদিকে তিনি শক্তির শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়েই বাংলা মঙ্গালকাব্যে প্রতিভাসিত শক্তির স্বরূপকে লৌকিক বলে উল্লেখ করেছেন। এই লৌকিক শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত — "সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনো ধর্মসংগত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই-সকল মঙ্গালকাব্যের প্রেরণা।"[২৬] অবশ্য একথাও তিনি স্বীকার করেছেন যে, "শাস্ত্রে দেবতার যে-স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সেইটেই যে আদিম এবং লৌকিকটাই যে আধুনিক এ কথা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত মানা যায় না। আমার বিশ্বাস, অনার্যদের দেবতাকে একদিন আর্যভাবের দ্বারা শোধন করে স্বীকার করে নেবার সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময়ে যে-সব দেবতা ভারতবর্ষের সাধুসমাজে প্রবেশ করেছিল তাদের চরিত্রে অসংগতি একেবারে দূর হতে পারে নি, তাদের মধ্যে আজও আর্য অনার্য দুই ধারা মিশ্রিত হয়ে আছে এবং লৌকিক ব্যবহারে সেই অনার্যধারারই প্রবলতা অধিক।"[২৭]

শাক্ত ও বৈষ্ণবের আচার-সংস্কার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যেন ঐতিহ্যের ধার ঘেঁষা। তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশে সাধারণত শাক্তধর্মসাধনা এবং বৈষ্ণবধর্মসাধনার মধ্যে দুই স্বতন্ত্রভাব প্রাধান্য লাভ করেছে। এক সাধনায় পশুবলি এবং মাংসভোজন, অন্য সাধনায় অহিংসা ও নিরামিষ আহার — এটা নিতান্ত নিরর্থক নয়। বিশেষ শাস্ত্রে এই পশু এবং অপরাপর মকারের যে ব্যাখ্যাই থাক্ সাধারণ ব্যবহারে তা প্রচলিত নেই। এইজন্যেই 'শক্তি' শব্দের সাধারণ যে-অর্থ, যে-অর্থ নানা চিহ্নে, অনুষ্ঠানে ও ভাবে শক্তিপূজার মধ্যে ওতপ্রোত এবং বাংলাদেশের মঙ্গালকাব্যে যে-অর্থ প্রচারিত হয়েছে আমি সেই অর্থই আমার রচনায় গ্রহণ করেছি।"[২৮]

মঙ্গালকাব্যের শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন এই পর্যন্তই। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রকৃত এই মূল্যায়নের অবমূল্যায়নও হয়েছে যথেষ্ট। যদিও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিয়েছেন যে, "কোনো ধর্মসাধনার উচ্চ অর্থ যদি দেশের কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যে কথিত বা জীবিত থাকে তবে তাকে সম্মান করা কর্তব্য। এমন-কি, ভূমিপরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকে বড়ো বলে জানা চাই। ধর্মকে পরিমাণের দ্বারা বিচার না করে তার উৎকর্ষের দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়।"[২৯] গীতার সাংখ্যযোগ-এর চল্লিশ সংখ্যক শ্লোকটি উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ শক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় আলোচনার উপসংহার করেছেন। যার অর্থ হলো — ভক্তিযোগের অনুশীলন কখনো ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনো ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে। রামপ্রসাদের একান্ত আকুতি তো এই শ্লোকের ভাবেরই অনুসারী — "আমি বিনা-মাইনের চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী।" রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে।" এরপরেও শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "ধর্ম ও দর্শন-রূপে ভারতীয় শক্তিবাদ কোন দিনই রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে নাই ; বরঞ্চ তাঁহার কোন কোন লেখায় স্পষ্টভাবেই শক্তিপূজার প্রচলিত ধর্মীয় রূপটি সম্বন্ধে তাঁহার মনের অশ্রদ্ধা এবং বিরূপতা প্রকাশ পাইয়াছে।"[৩০] শক্তিতত্ত্ব এবং শাক্ত ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক বিচার ও পর্যালোচনার দিকে দৃষ্টিপাত করলে শশিভূষণ এই অসচেতন মন্তব্য করতেন না। পরবর্তীকালে তাঁর এই মন্তব্যের ভিত্তিতেই বহু সমালোচক শক্তিতত্ত্বের রবীন্দ্রকৃত মূল্যায়নের কঠোর সমালোচনা করেছেন — যা একেবারেই অভিপ্রেত ছিল না।

ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরম্পরা রক্ষায় রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং দর্শন বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। তাঁর কাব্যে সত্য-শিব-সুন্দরের সমন্বিত রূপ চিরাচরিত বিশ্বাস ও বিশ্রুতিকেই প্রাধান্য দিয়েছে। 'বিসর্জন' নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে' গানটিতে যেমন জগজ্জননীর ভীষণ রূপ বিচ্ছুরিত হয়েছে, তেমনই 'পূরবী'র 'তপোভঙ্গ' কবিতায় শিব-পার্বতীর বিরহমিলনলীলারসের উচ্ছলতায় ব্যক্তিসত্য বিশ্বসত্যরূপে দেখা দিয়েছে। শিবশক্তির এই দ্বৈতসংগীতে পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলনেই পরিপূর্ণ সাধনরহস্য উদ্ঘাটিত। এ প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বৈরাগ্য-সাধন কবিকর্ম নয়; কবি সুন্দরের পূজারী, প্রেমের পূজারী। প্রলয়ংকর শংকর নয়, পার্বতী-পরমেশ্বরই তাঁর উপাস্য দেবতা।... কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশে'র

আদিশ্লোকেই জগতের পিতামাতা পার্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে কালের অধীশ্বর পরমেশ্বর শিবের বিচিত্র রূপ। কিন্তু 'তপোভঙ্গে' কবি উমা-মহেশ্বরের মিলনলীলার কবিভক্ত। এই অর্থেই তিনি মহেন্দ্রের 'তপোভঙ্গ দূত'।"[৩১] 'শক্তির সাধনা' ও 'রসের সাধনা'কে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন-পরিক্রমা পূর্ণতা পেয়েছে। সৃজন ও প্রলয়ের পথে সুন্দরের আবির্ভাব। সেই সুন্দরের আরাধনায় কবিরা মগ্ন চিরকাল। রবীন্দ্রনাথের শিবশক্তিতত্ত্বের চর্চায় নিষ্কাম জীবনসাধনায় সমর্পিত প্রাণের দুর্গম যাত্রাপথ-আরোহণের দিকটিই গুরুত্ব পেয়েছে সর্বাধিক। আত্মমগ্ন সাধনসংগীতে রুদ্রবীণার ঝংকার যেমন তাঁর সৃষ্টিশক্তির প্রাচুর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে তেমনই সমালোচন-পদ্ধতির যৌক্তিক বিন্যাসের স্তরগুলি উন্মোচনে অনুকূল হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', 'সাহিত্য', রবীন্দ্র-রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০১৭, চতুর্থ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪২২, পৃ. ৬৮০ (অতঃপর 'রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড' নামে উল্লিখিত)

২। 'বাংলা মঙ্গালকাব্যের ইতিহাস', আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড ও সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম যৌথ প্রকাশ মে ২০১৫, পৃ. ১৫২

৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৮০

৪। 'সৌন্দর্যবোধ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩৫

৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৭৭

৬। ওই, পৃ. ৬৭৮

৭। 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, অষ্টম মুদ্রণ কার্তিক ১৪১৬, পৃ. ১০ (অতঃপর 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' নামে উল্লিখিত)

৮। ওই, পৃ. ১০

৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৭৮

১০। ওই, পৃ. ৬৭৯

১১। 'কবির দীক্ষা', 'কালের যাত্রা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, একাদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪২১, পৃ. ২৮২

১২। রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৭৯

১৩। ওই, পৃ. ৬৭৯

১৪। ওই, পৃ. ৬৮০

১৫। ওই, পৃ. ৬৮১

১৬। ওই, পৃ. ৬৮৩

১৭। ওই, পৃ. ৬৮৩

১৮। ওই, পৃ. ৬৮৪

১৯। 'গ্রন্থপরিচয়', 'আধুনিক সাহিত্য', রবীন্দ্র-রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০১৭, পঞ্চম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ৮১২

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তার উন্মেষ সম্পর্কে সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'এর চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন, "স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনা তাঁহার নিজস্ব। এবং এ ভাবনা ভারতীয় অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যের মূলাশ্রয়ী। সে মূলের দুইটি প্রধান শাখা। এক উপনিষদের আনন্দদর্শন, দুই বৈষ্ণব সাধনার লীলাবাদ (এবং সেই সঙ্গে সহজ সাধনার তত্ত্বমুক্ত সর্বাস্তিবাদ)। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কর্মে উপনিষদের প্রভাব সকল আলোচনাকারীই স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লইয়াছেন। তাহা সর্বাংশে ঠিক নয়। উপনিষদ্ পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আনন্দদর্শন ও সর্বাস্তিবাদ গঠন করেন নাই। তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন নিজের দৃষ্টিতে, কল্পনায়, অনুভবে। আপন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হইতেই সে কাজের শুরু। আগে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে একথা বোঝা দুঃসাধ্য হইবে না। রবীন্দ্রনাথ যখন উপনিষদের বাণীর অর্থ করিতে পারিয়াছিলেন তখনই তাহাতে নিজের মনের সায় মিলিয়াছিল। পরে তা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাই উপনিষদের বাণীর ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি তাঁহার রচনায় নিরন্তর গুঞ্জরিত।"

২০। 'বাতায়নিকের পত্র', 'কালান্তর', রবীন্দ্র-রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০১৭, দ্বাদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, পৃ. ৫৭০ (অতঃপর 'রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড' নামে উল্লিখিত)

২১। 'ভূমিকা', 'শাক্ত পদাবলী', অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বাদশ সংস্করণ ২০১০, পৃ. প

২২। 'ছেলেবেলা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৬আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০১৭, ত্রয়োদশ খণ্ড,

পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৪২২, পৃ. ৭২২
২৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৫৭০
২৪। ওই, পৃ. ৫৮৩
২৫। ওই, পৃ. ৫৮৪
২৬। ওই, পৃ. ৫৮৪
২৭। ওই, পৃ. ৫৮৪
২৮। ওই, পৃ. ৫৮৫
২৯। ওই, পৃ. ৫৮৫
৩০। 'ভারতীয় শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', পৃ. ৩২৭
৩১। 'রবীন্দ্রকবিতাশতক', জগদীশ ভট্টাচার্য, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২৫, পৃ. ৪১৪

লেখক পরিচিতি :

শম্ভুনাথ কর্মকার : বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের পিএইচডি গবেষক। গবেষণার বিষয় " 'ধ্বনি'র আলোকে নির্বাচিত বাংলা কবিতা : একটি বিশ্লেষণ"। প্রকাশিত গ্রন্থ 'রবীন্দ্রকবিতায় বস্তুধ্বনি', 'সাক্ষাতে বলব', 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যকল্পধারা'।